বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

মা সি ক

কুতুববাগ দরবার শরীফের মুখপত্র

আত্মার আলো

সুফিবাদই শান্তির পথ : খাজাবাবা কুতুববাগী

ঢাকা বৃহস্পতিবার ৬ নভেম্বর ২০১৪ ॥ ২২ কার্তিক ১৪২১ ॥ ১২ মহররম ১৪৩৫ ॥ পরীক্ষামূলক প্রকাশনা ॥ সংখ্যা ৮

হাদিয়া : ১০ টাকা

খাজা গোলাম রব্বানীর (রহ.)-এর মাজার শরীফ, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ

নির্মাণাধীন কুতুববাগ দরবার শরীফ জামে মসজিদ, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ

নামাজে হুজুরি দিল না হলে এবাদতে আল্লাহর মহব্বত সৃষ্টি না হলে এবাদত গ্রহণযোগ্য হয় না

আলহাজ্ব মাওলানা সৈয়দ জাকির শাহ নকশবন্দি মোজাদ্দেদি

সহিহ্ হাদিস শরীফে আছে– ‘লা-সালাতা ইল্লাবি হুজুরিল ক্বাল্‌বি’। অর্থাৎ : হুজুরি দিল ছাড়া নামাজ শুদ্ধ হয় না। আল্লাহতায়া’লা বলেছেন, যে তার পালনকর্তার সঙ্গে সাক্ষাতের আশা রাখে, তার উচিৎ সে যেন নেককাজ করে এবং তার সৃষ্টিকর্তার এবাদতে কাউকে শরীক না করে।

যেমন, ‘ফামান কানা ইয়ারজু লি-ক্বয়া রাব্বিহি ফাল ইয়ামাল আমালান সলেহান অলা ইউস্‌রেক বি-ইবাদাতি রাব্বিহি আহাদান’।

বর্তমানে নামাজিদের নামাজের কী অবস্থা, তা একটু চিন্তা করে দেখুন। নামাজি ব্যক্তি বলেন, নামাজে (আলহামদু) ইয়াকা-না বুদু-ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাইন’। অর্থাৎ : আমি তোমারই বন্দেগী করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি। এই আয়াত যখন পাঠ করা হয়, তখন কার কথা বা রুপ ওই নামাজি ব্যক্তির ধ্যানে থাকে? প্রায়ই দেখা যায়, যে যা ভালোবাসে বা যার ভালোবাসা অন্তরে পোষণ করে, তার কথাই তখন তার ধ্যানে আসে। অথচ অন্য সময় অপেক্ষা নামাজের মধ্যেই নানা প্রকার সাংসারিক চিন্তা ও বাজে-বাহুল্য বিষয় হৃদয়ের ভিতর আরও বেশি ঘনীভূত হয়ে উপস্থিত হয়। এ সম্বন্ধে কোন এক কবি তাঁর শায়েরে বলেছেন–

‘জাবা দর জেকরে, ওয়া দের দর ফেকরে খানা,
চে হাসেল শোদ-জী নামাজে পাঞ্জেগানা।
চে শোদ গার মসহা-ফাহ দর পেশে বাশোদ
চু দেল দর ফেকের গাওউ মেশে বাশোদ।’

অর্থাৎ : মুখে আল্লাহর জিকির ও মনে বাড়ি-ঘরের চিন্তা থাকলে, সে রকম পাঞ্জেগানা নামাজে তোমার কী ফল হবে? তোমার মনে যদি গরু ও মেষের ভাবনা থাকে, তবে সামনে কোরআন খুলে রাখলে কী ফল হবে?

অতএব, খোদার এবাদতে ঘোড়া, গরু, ভেড়া-বকরী, স্ত্রী-পুত্রকে গায়রুল্লাহ ভেবে আমরা বাতেনে মোশরেক হচ্ছি। এ যে কত বড় ভয়ঙ্কর ও পাপের কাজ করে চলেছি আমরা, তা বুঝতে পারছি না। এ ধরনের শেরক থেকে মুক্তির চেষ্টা করা কি আমাদের কর্তব্য নয়? সৃষ্টিকে ভুলে স্রষ্টার প্রতি গভীরভাবে নিমগ্ন হয়ে শুদ্ধ আত্মায় কবুলিয়াতের নামাজ আদায় করা প্রতিটি ঈমানি মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য নয় কি? রাসুল (স:) সাহাবিদের, যে নামাজ শিক্ষা দিতেন, সে নামাজ ছাড়া আর কোন নামাজ আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে কবুল হয় না। কিন্তু আমরা সে বিষয়ের বা পদ্ধতির কতটুকু মেনে নামাজ পড়ার চেষ্টা করি?

‘ইন্নাল-লাহা লা-ইয়াগফির আন ইউস্‌রিকা বিহী ওয়া ইয়াগফির মাদূনা জালিকা লি-মাইয়াশা’।

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহতায়া’লা তাঁর সঙ্গে শেরককারীকে ক্ষমা করবেন না এবং এছাড়া তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন।

রাসুলুল্লাহ (স:) বলেছেন– ‘আনতাবুদাল্লাহা কা-আন নাকা তারাহু ফাইল্লাম তাকূন তারাহু ফা-ইন্নাহু ইয়া রাকা’।

অর্থাৎ, তুমি এমনভাবে আল্লাহতায়া’লার বন্দেগী কর, যেন তুমি আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছো। যদি তা না পার, তবে এমনভাবে আল্লাহর এবাদত কর, যেন আল্লাহ তোমাকে দেখছেন।

এই হাদিস থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, সমস্ত নামাজেই আল্লাহর মোশাহেদা (দর্শন) করতে হবে। হযরত আনাস (রা:) থেকে অন্য এক হাদিস শরীফে রেওয়ায়েত আছে– ‘ইন্নাল মোকমিনূনা ইজা-কানা ফিস্ সালাতি ফা-ইন্নামা ইউসাব্বি রাব্বাহু।’

অর্থাৎ : নিশ্চয় মমিন ব্যক্তি নামাজের মধ্যে তার পালনকর্তার সঙ্গে কথোপকথন করে থাকেন।

হযরত ইমাম আবু হানিফা (রহ.) যে রায় দিয়েছেন– নামাজের প্রথম তাকবিরের সময় আল্লাহতায়া’লাকে স্মরণ হলেই নামাজ হয়ে যাবে। এর অর্থ এই নয় যে, নামাজের অন্য অংশে আল্লাহতায়া’লাকে স্মরণ করতে হবে না। বরং এ কথার মর্মে বুঝা যায় যে, নামাজের সব অংশেই আল্লাহকে স্মরণ রাখতে হবে। কিন্তু কেউ যদি কোন ওজরবশত তাতে অক্ষম হয়, তবে প্রথম তকবিরে আল্লাহতায়া’লাকে স্মরণ করলেও তার নামাজ হয়ে যাবে। এটা তিনি নাচারী অবস্থায় মত দিয়েছেন। তাই বলে, তিনি এটা বলেননি যে, তোমরা জীবনভর ওইভাবে নামাজ পড়ো।

পবিত্র কোরআনের সূরা বাকারাহ্ ২০৮ নাম্বার আয়াতে আছে– ‘ইয়া আইয়্যুহাল্লাযিনা আমানুদ খলু সিলমি কা-ফ্‌ফাহ , অলা-তাত্তাবিউ খুতু ওয়াতিশ শাইত্বোয়ান ইন্নাহু রাকুম আদুউম মুবিন।’

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমরা সম্পূর্ণরুপে ইসলামে প্রবেশ কর, আর শয়তানের (কুমন্ত্রণাদানকারীর) পদাঙ্ক অনুসরণ কোরো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

তাসাউফ ও মারেফতের জ্ঞান ছাড়া অন্তরের রোগ দূর হয় না

আলহাজ্ব মাওলানা সৈয়দ হযরত জাকির শাহ্ নকশ্‌বন্দি মোজাদ্দেদি

মানুষের স্থুল দেহের রোগমুক্তি ও পুষ্টিসাধনের জন্য যেমন নানা প্রকার ওষুধ ও পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়া প্রয়োজন, সে রকম পরমাত্মারও (রুহে ইনসানীরও) ওষুধ ও পুষ্টিকর খাদ্যের আবশ্যক। পরমাত্মা আজ উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে, পুনরায় চেতনা ফিরে না পাওয়া বা আত্মাকে রোগমুক্ত না করার কারণে দুর্বলতায় আত্মার ক্ষুধামন্দা হয়েছে। এর ফলে ওই আত্মার কাছে ধর্মের সুমধুর বাণী শুনতে অরুচি। ধর্মের বাণী তিক্ত জ্বালাময় বোধ হয়। তাই সে ধর্মীয় কাজের বিপরীত অবস্থানে রুগ্ন ব্যক্তির মতো কুপথ্য স্বরুপ ধর্মবিরোধী গর্হিত কাজ বা বাক্য শ্রবণ করে। এখন সে জীবন্মৃত অবস্থায় দিন দিন কুপথে অগ্রসর হচ্ছে। কাজেই এলমে তাসাউফ ছাড়া এমন আত্মাকে সুপথে ফিরিয়ে আনা অসম্ভব।

আত্মার এই রোগমুক্তির জন্য আল্লাহতায়া’লা সুব্যবস্থাও করেছেন। আল্লাহ বলছেন, আমি বান্দাদের মধ্যে এমন একদল লোক সৃষ্টি করেছি, যারা লোকদিগকে সৎ রাস্তা বা সরল পথ দেখিয়ে থাকে।

যেমন : ‘অমিম-মান খালক্‌না উম্মাতাই ইহাহ্-দূনা বিল হাক্কি’

অর্থাৎ : আমার সৃষ্টির মধ্যে এমন এক সম্প্রদায় আছে, যারা মানুষকে সৎ পথ দেখিয়ে থাকে, রাসুল করিম (স:) এ রুপ হেদায়েতকারী হাদিদের আগমনের শুভ সংবাদ দিয়েছেন।

যথা : ‘ইন্নাল-লাহা আজ্বাযা ওয়া জাল্‌লা ইয়াব আসূ লিহা-যিহিল উম্মাতি আলা রা-আছি কুল্লি মিয়াতি মিন ছানাতি ইয়াজদাদু লা-হুমা দিনূহা’(রাওয়াহু-আবু দাউদ)

অর্থাৎ : নিশ্চয় মহান আল্লাহতা’য়ালা একশ বছর পর পর তাঁর বান্দাদের জন্য, এমন এক ব্যক্তিকে সৃষ্টি করেন, যিনি দ্বীনকে (ধর্মকে) তাজা (সজীব ও সতেজ) করেন। আবু দাউদ রাওয়ায়েত করেছেন রাসুলুল্লাহ (স:)-এর ভিতরে এমন এক স্বর্গীয় শক্তি নিহিত ছিল যে, তাঁকে দেখলে মানব হৃদয় সহজেই প্রেমরসে বিগলিত হয়ে যেত এবং পাপের বাসনা দূর হয়ে মুহূর্তেই মানুষ পূর্ণ ঈমানদার তথা আল্লাহর পিয়ারা বা আশেক হয়ে যেত। মোজাদ্দেদগণ রাসুলুল্লাহর সেই নিয়ামত নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করেন। সুতরাং তিনিও মোজাদ্দেদ, তিনি যখন মানবকে আল্লাহ ও রাসুল (স:) এর বাণী শুনান তখন মানব হৃদয় প্রেমরসে গলে যায় এবং পাপের বাসনা দূর হয়ে মুর্দাদিল জিন্দা হয়; মুহূর্তেই সে ব্যক্তি পূর্ণ ঈমানদার ও আল্লাহ-রাসুলের আশেক-প্রেমিক হয়ে যায়। ২-এর পাতায় দেখুন

আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর দৃষ্টিতে ইলমে তাসাউফ শিক্ষা ফরজ হওয়ার দলিল

আলহাজ্ব মাওলানা সৈয়দ জাকির শাহ নকশবন্দি মোজাদ্দেদি

হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহাম্মদ মুজ্‌তবা (স.)-এর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, ইলমে তাসাউফ শিক্ষা করা কি ফরজ? উত্তরে হযরত বলেছেন, হ্যাঁ, ইলমে তাসাউফ শিক্ষা করা ফরয। যেহেতু আল্লাহতা’য়ালা বলেছেন, ‘ইত্তা কুল্লাহা হাক্‌কা তুক্বতিহি’ তোমরা আল্লাহকে ভয় করার মত ভয় কর। যার পারিভাষিক অন্য নাম তাসাউফ। এখানে ব্যবহৃত শব্দের মধ্য দিয়ে ওয়াজিব প্রমাণিত হয়। অবশ্য এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর সাহাবায়ে কেরামগণ অক্ষমতার আবেদন করায় অন্য আয়াত ‘ফাত্তা কুল্লাহা মাস্‌তা তা-তুম’ নাযিল হওয়ায় অনেকে একে নাকেচ বলে গণ্য করে, আগের নির্দেশরহিত সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু আল্লামা থানভী (রহ.) বলেছেন যে, তাফসীরের পারিভার্ষিক অর্থের প্রতি লক্ষ্য করলে রহিত হওয়ার বিষয় পরিস্কার হয় না। বরং আমার গবেষণায় এখানে পরবর্তী আয়াতের মাধ্যমে আগের আয়াতের তাফসীর বা ব্যাখা করা হয়েছে। কারণ, এর আগের আয়াত থেকে বুঝা যাচ্ছিল তাৎক্ষণিকভাবে আয়াতের বর্ণিত হুকুম অনুযায়ী আমল করা ফরজ। যা সাহাবায়ে কেরামগণ কঠিন মনে করেছিলেন। অত:পর আয়াতের তাফসির হিসাবে আল্লাহতা’য়ালা ‘ফাত্তা কুল্লাহা মাস্‌তা তা-তুম’ আয়াত নাযিল করে সাহাবাদের সংশয় দূর করে দেন।

কেন যেতে হয় কুতুববাগে

নাসির আহমেদ

পরিচিত অনেকেই প্রশ্ন করেন, কুতুববাগে কেন যান? সেখানে গিয়ে কী পান? তাদের ভাষ্যমতে, ঠিকমত নামাজ- রোজা করলে, আল্লাহকে ডাকলে আবার পীর লাগে নাকি? আর পীরের কথা কোরআনেও তো নাই। কোরআনে যে একাধিক জায়গায় মুর্শিদ শব্দটি আছে, আর মুর্শিদ শব্দটি আরবি ভাষা থেকে ফার্সি ভাষায় গিয়ে এই উপমহাদেশে পীর নামে পরিচিত হয়েছে, এ কথা আর কতজনকে বলবো? তবু কিছু প্রশ্নের জবাব দিতে চাই। প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবার আগে কিছু প্রাসঙ্গিক কথা বলা যেতে পারে। সুফিবাদই যে শান্তির পথ– সে কথা আমাদের মহান মুর্শিদ খাজাবাবা কুতুববাগী ক্বেবলাজান হুজুর মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দিতে নিজেকে যেমন দিনরাত নিবেদিত রেখেছেন, তেমনই যারা তাঁর আশেক-জাকের তাদেরকেও তিনি সুফিবাদের দাওয়াত শুধু বাংলাদেশে নয়, ২-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদকীয় কলাম

কুতুববাগ দরবার শরীফের বার্ষিক মহাপবিত্র ওরছ ও বিশ্বাজাকের ইজতেমার প্রস্তুতি চলছে এখন। সারাদেশর জাকেরবৃন্দ ২০১৫ সালের ২২ ও ২৩ জানুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য ওরছ শরীফ সফল করে তুলতে নিরন্তর কাজ করে চলেছেন। এ বছর আমাদের প্রাণপ্রিয় মুর্শিদ শাহসুফি আলহাজ্ব মাওলানা সৈয়দ হযরত জাকির শাহ নকশবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী ক্বেবলাজান হুজুর ইতিমধ্যে রাজশাহী, কুড়িগ্রাম, খুলনা, বেনাপোল, ঝিনাইদহ, ফরিদপুর, মাদারীপুর, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, ময়মনসিংহ, জামালপুর, শেরপুরসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল সফর করেছেন। তিনি যেখানেই গেছেন, সেখানেই মানুষের ঢল নেমেছে। লাখ লাখ ধর্মপ্রাণ মানুষ, খাজাবাবার সুমধুর কণ্ঠে মহা মূল্যবান নসিহত শুনে, আল্লাহ-রাসুলের সত্য তরিকতের বাইয়াত গ্রহণ করেছেন।

এই দ্বীনি দাওয়াতের অংশ হিসেবে মুর্শিদ ক্বেবলাজান এখন রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় মাহফিল করছেন। মানুষকে সুফিবাদের শান্তির পথ অনুসরণ করে মানবতাবাদের সবুজ ছায়ার নিচে আশ্রয় গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছেন। হানাহানি আর অশান্তির এই বিশ্ববাস্তবতায় কুতুববাগী ক্বেবলাজান হুজুর আত্মশুদ্ধি, দিলজিন্দা ও এবাদতে হুজুরি অর্জনের মধ্য দিয়ে মানুষকে পরম করুণাময় আল্লাহতায়া'লার নৈকট্য লাভের পথ দেখাচ্ছেন।

আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহাম্মদ মুজ্‌তবা (সঃ)-এর মহান বাণী এবং পবিত্র কোরআনের আলোকে ইহকাল ও পরকালের শান্তির পথে আসার এই আহ্বানে অসংখ্য মানুষ ইতিমধ্যেই সাড়া দিয়েছেন। আসুন, আমরা সবাই মিলে অলি-আল্লাহদের আত্মার মহামিলনের বার্ষিক ওরছ শরীফ ও বিশ্বজাকের ইজতেমা সফল করে তুলতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাই। রাজধানীর অবশিষ্ট মাহ-ফিলগুলোতে দলে দলে শামিল হয়ে সুফিবাদের শান্তির পথ আরও প্রশস্ত করি। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সে তৌফিক দান করুন। আমিন।

বিজ্ঞপ্তি

কুতুববাগ দরবার শরীফ এর মহাপবিত্র ওরছ ও বিশ্বজাকের ইজতেমা ২০১৫

সম্মানিত আশেক-জাকের ভাই ও বোনেরা

আসসালামু আলাইকুম

আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন যে, প্রতি বছরের মত এবারও কুতুববাগ দরবার শরীফের মহাপবিত্র ওরছ ও বিশ্বজাকের ইজতেমার তারিখ নির্ধারণ করা হয়ে গেছে। আগামী ২২ ও ২৩ জানুয়ারি ২০১৫, রোজ : বৃহস্পতি ও শুক্রবার এই দ্বীনি মাহফিল অনুষ্ঠিত হবে। স্থান : ঢাকার ফার্মগেটের ৩৪ ইন্দিরা রোডে, কুতুববাগ দরবার শরীফ সংলগ্ন আনোয়ার উদ্যান।

ওরছ শরীফ ও বিশ্বজাকের ইজতেমায় শরিয়ত, তরিকত, হাকিকত ও মারেফত বিষয়ে পবিত্র কোরআন-হাদিস, ইজমা ও কিয়াস এর আলোকে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা, তাফসির ও জিকিরের তালিম দেয়া হবে। এতে দেশের বিভিন্ন জেলা ও বিশ্বের নানান দেশ থেকে লাখ লাখ আশেকান-জাকেরান, ভক্ত-মুরিদানসহ বিশিষ্ট আলেম-ওলামা, মুফতি-মোহাদ্দেসগণ অংশ গ্রহণ করবেন।

দরবার শরীফ থেকে ওরছ ও বিশ্বজাকের ইজতেমা ২০১৫ এর সার্বিক প্রস্তুতি চলছে। সে জন্য দেশ-বিদেশের জাকের ভাই-বোনেরা ওরছ শরীফ ও বিশ্বজাকের ইজতেমা সফল করার লক্ষে অংশগ্রহণ ও দাওয়াত কাজে শরিক হোন। আল্লাহ ও রাসুলের যে ইসলাম, সারাবিশ্বে সেই ইসলামের সত্য তরিকা প্রচার ও আহলে বাইয়াতের প্রসার করার লক্ষে এগিয়ে এসে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সবাইকে সার্বিক সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য আহ্বান করা হলো।

২৩ জানুয়ারি ২০১৫ রোজ : শুক্রবার বাদ জুমা বিশ্ববাসীর শান্তি ও কল্যাণের উদ্দেশ্যে মহা মূল্যাবান নসিহতবাণী ও আখেরী মোনাজাত করবেন শাহানশাহে তরিকত, আরেফে কামেল, মুর্শিদে মোকাম্মেল, হেদায়েতের হাদি, জমানার মোজাদ্দেদ, শাহসুফি আলহাজ্ব মাওলানা সৈয়দ হযরত জাকির শাহ নকশবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী ক্বেবলাজান হুজুর।

খাজাবাবা কুতুববাগী ক্বেবলাজান হুজুর সবার সুস্বাস্থ্য ও মঙ্গল কামনা করছেন। অলি-আল্লাহদের আত্মার মহামিলনের এই দ্বীনি মাহফিলে শরিক হতে আল্লাহ আমাদের সবার তৌফিক দান করুন। আমিন।

বি:দ্র: দুই দিনব্যাপী এই দ্বীনি ওরছ-মাহফিলে দেশ-বিদেশ থেকে আগত জাকের ভাই-বোনদের থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে। শীতবস্ত্র সঙ্গে আনবেন।

বিজ্ঞপ্তি

সম্মানিত পাঠক, জাকের ভাই-বোনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মাসিক আত্মার আলো পত্রিকায় আপনাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্যের বিজ্ঞাপন আহ্বান করা হল। এই পত্রিকায় সূলভ মূল্যে সম্পূর্ণ রঙিন বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে আপনার প্রতিষ্ঠানের প্রচার ও প্রসারের লক্ষে আমরাও সামান্য ভূমিকা রাখতে চাই।

যোগাযোগ
মাসিক আত্মার আলো
৩৪ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৭২৬৪৫৯০০৪, ০১৭২৩৪৮২২৯৪, ফোন : ৮১৫৬৫২৮
ই-মেইল: masikattaralo@gmail.com, www.kutubbaghdarbar.org.bd

তাসাউফ ও মারেফতের জ্ঞান ছাড়া অন্তরের রোগ দূর হয় না

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আবার যখন মোজাদ্দেদ পৃথিবী থেকে চলে যান তখন তাঁর অধীনস্থ আউলিয়াদের পরম্পরায় রাসুলুল্লার (স:)-এর ওই (গুণ) চলতে থাকে এবং ক্রমে ক্রমে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ওই এশ্‌ক ও মহব্বত কমতে থাকে। মানুষ তখন আল্লাহ ও রাসুল (স:)-এর এশ্‌ক-মহব্বত হারিয়ে দিন দিন কুপথে ধাবিত হতে থাকে। কোরআন-হাদিসের বাণী ও ওয়াজ-নসিহত শোনে কিন্তু তা আমলের সময় আমল করে না। শুধু নফস আম্মারার বশবর্তী হয়ে নানা প্রকার পাপকাজে লিপ্ত হয়ে যায়। মোটকথা পৃথিবী যখন অনাচার অত্যাচার ব্যভিচারে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়, আল্লাহতায়া'লা দয়া করে ওই সময় দ্বীনকে তাজা বা সজীব করার জন্য, আর একজন মোজাদ্দেদ পাঠান দুনিয়ার বুকে। এইভাবে একশ বছর পর পর মোজাদ্দেদ পাঠিয়ে দ্বীনকে তাজা বা সজীব রাখবেন। রাসুল (স:)-এর পর কিয়ামত পর্যন্ত জগতে আর কোন পয়গম্বর বা নবী আসবেন না। সুতরাং মোজাদ্দেদ ও তাঁর অধীনস্থ আউলিয়াদের দ্বারাই পয়গম্বরের কাজ চলতে থাকবে।

তাসাউফ সম্পর্কে হযরত ইমাম মালেক (রহ.) বর্ণনা করেছেন– 'মান তাসাওউফা ওয়ালাম ইয়াতাফাকাকাহু, ফাক্বদ তাযানদাক্বা, ওয়া মান তাফাক্বাহা-ওয়ালাম ইয়া-তাসাওউফ ফাক্বদ তাফাস্‌-সাক্বা, ওয়া মান জামাআ বাইনাহুমা ফাক্বাদ তাহাক্বাকা'

অর্থাৎ : যে ব্যক্তি তাসাউফ অর্জন করল ফিকাহ (শরীয়ত) ছাড়া, সে জিন্দিক (কাফের)। যে ব্যক্তি শুধু ফিকাহ (শরীয়ত) অর্জন করল, তাসাউফ ছাড়া, সে ফাসেক (মিথ্যাবাদি)। আর যে এই দুটোই অর্জন করল, সে পূর্ণ মুমিন। (মেরক্বাত শরীফ)

এ থেকে বুঝা যায় শরিয়ত আর তাসাউফ পাশাপাশি। তাই একজন পূর্ণ মুমিন হওয়ার জন্য এই দুটি বিষয়ই অর্জন করা প্রয়োজন। মোটকথা শরিয়ত ছাড়া তাসাউফ (মারেফত) পূর্ণ হয় না, মারেফত ছাড়া ফিকাহ্ (শরিয়ত) পূর্ণ হয় না।

'আশ্‌শরীয়াতু আকওয়ালী, আত্তারীক্বাতু আফওয়ালী, আল হাক্বীকাতু আহ্‌ওয়ালী, আল মারেফাতু আছরারী'

অর্থাৎ : হযরত রাসুলে করিম (স:) বলেন, শরিয়ত আমার বাক্য, তরিকত আমার কাজ, হাক্বিকত আমার অবস্থান এবং মারেফত আমার নিগূঢ় রহস্য।

তাই আত্মাকে খোরাক দানের মধ্যেই সুখ-শান্তি নির্ভরশীল। মুর্শিদের সরণে বা মোরাকাবা থেকেই মুরিদের হৃদয়ে মহব্বত সৃষ্টি হয়। এমন সরণ বা মোরাকাবাই আত্মার প্রকৃত খোরাক। এতে আত্মা যেমন সজীব-সতেজ ও শক্তিশালী হয়, তেমনি নির্মল, নিরোগ ও পাপমুক্ত থাকে। মুর্শিদের সরণ বা মোরাকাবা থেকে বিরত থাকলেই, আত্মার উপবাস বা আত্মা দুর্বল হয়ে যায়। তখন নানান পাপ, রোগ, অশান্তি আত্মায় প্রবেশ করে আক্রমন করতে থাকে। আর তখন এভাবেই আত্মা কলুষিত হয়ে যায়।

কেন যেতে হয় কুতুববাগে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সারা পৃথিবীতেই ছড়িয়ে দেবার আহ্বান জানিয়েছেন। বিশ্বের দেশে দেশে সেই দাওয়াত যাচ্ছে জাকের ভাই-বোনদের মাধ্যমে। একুশ শতকের আধ্যাত্মিক মহাসাধক খাজাবাবা সৈয়দ হযরত জাকির শাহ্ নকশবন্দি মোজাদ্দেদি নিজে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা, উপজেলা সফর করে মানুষকে সুফিবাদের দাওয়াত দিচ্ছেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সফর করছেন। অক্লান্ত তাঁর এই ভ্রমণ। তিনি বলেন, বাবারা– আমিও আমার মহান মুর্শিদের হুকুম পালন করছি মাত্র। আমিও আপনাদের মতো তরিকতের একজন কর্মী। অনেকে বলবেন তরিকত আবার কী? আরবি তরিকুন শব্দ থেকে তরিক। তরিক শব্দের অর্থ যে পথ, আর তা থেকেই, তরিকা বা জ্ঞানের রাস্তা, তা বুঝতে হলেও সুফিবাদের দীক্ষা গ্রহণ করা ছাড়া কোন উপায় নেই।

যারা সুফিবাদ কী বুঝতে পারেন না, তাদের মনে অনেক খটকা থাকতেই পারে। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ-রোজা পালন করার পর আল্লাহর হুকুম আহকাম মানলে আবার সুফিবাদ শিখতে পীরের কাছে যেতে হবে কেন? হয়তো এ কারণেই পরিচিতজনরা এমন কঠিন প্রশ্ন করেন। অনেকে এমনও বলেন, আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া একজন আধুনিক মানুষ, কবি-সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শক্ত যুক্তি দিয়ে জঙ্গিবাদ-মৌলবাদের বিরুদ্ধে কলাম লেখেন, অন্ধ বিশ্বাসের কাছে গিয়ে কেমন করে আত্মসমর্পণ করেন? তাদের এ প্রশ্নেরও জবাব আশা করি এ লেখা থেকে তারা পাবেন। ইসলাম আর জঙ্গিবাদ-মৌলবাদ যে এক জিনিস নয়, ইসলামের বিপরীতে এর অবস্থান, এই সত্যটুকু উপলব্ধি করলে হয়তো এমন শান্তির ধর্ম ইসলাম আর সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ মিলিয়ে প্রশ্ন করতেন না। ধার্মিক হয়েও প্রগতিশীল হওয়া যায়। ধর্মের সঙ্গে প্রগতির বিরোধ নেই। ইসলামে তা বলে না।

পৃথিবীতে আস্তিক এবং নাস্তিক দুই শ্রেণির মানুষ আছেন। আস্তিকরা বিশ্বাস করেন– সর্বশক্তির উৎস আল্লাহ বা স্রষ্টা আছেন। ইহকালের পরে মরণোত্তর আর একটি জীবন আছে, যার নাম পরকাল। একদিন কিয়ামত হবে, ভালোমন্দ কর্মের বিচার হবে সেই পরকালে। ভালো কর্মের জন্য অনন্ত শান্তির জগতে বিরাজ করবে মানবাত্মা আর কুকর্ম বা পাপের জন্য অনন্তকাল অশান্তির অনলে জ্বলতে হবে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ এবং তাঁর প্রেরিত রাসুল মহাপুরুষ নবীগণ আর আসমানি কিতাবের ওপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করেন আস্তিকেরা।

পক্ষান্তরে নাস্তিক বা অবিশ্বাসীরা মনে করেন আল্লাহর অস্তিত্ব তারা স্বীকার করেন না। এমন কি মৃত্যুর পর যে আবার মানবাত্মার উত্থান হবে আর অন্য একটা জগতে বাস করবে এবং কর্মফল অনুসারে বেহেশত-দোজখ বা স্বর্গ-নরকে যেতে হবে, এসবের কোনো কিছুই তারা যৌক্তিক মনে করেন না। বিশ্বাসও করেন না। সুতরাং দুই শ্রেণির মানুষের দৃষ্টভঙ্গি দুই রকম। ইসলামসহ পৃথিবীর প্রতিটি ধর্মই বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিশ্বাসীদের জন্যই ধর্ম। অবিশ্বাসীদের জন্য নয়। সুতরাং আমরা যারা এক আল্লাহ এবং তাঁর প্রেরিত মহাপুরুষ সর্বশ্রেষ্ঠ ও শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স:) এর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি, পবিত্র কোরআন-হাদিস এবং কালেমাসহ ইসলামের যাবতীয় বাধ্যবাধকতায় বিশ্বাস স্থাপন করেছি– তাদেরকে কেমন করে গ্রহণ করবেন, যারা এসব বিশ্বাস করেন না? তাদের কাছে তো 'অন্ধ বিশ্বাস' মনে হবেই। কারণ, সর্বশক্তিমান আল্লাহ চর্মচক্ষে দৃশ্যমান কেউ নন। ধর্মমতে তিনি সর্বত্র বিরাজমান। শুধু নিমগ্ন অন্তরে সহি নামাজেই মমিনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হতে পারে। তাই কোরআন-হাদিস মতে 'আল্লহর স্থান মমিন লোকের কুলব' বা হৃদয়ে। আল্লাহর প্রেরিত নবীগণ, কোরআনসহ আসমানি কিতাবসমূহ এবং বেহেশত-দোজখ, এমন কি স্বয়ং আল্লাহও তো বিশ্বাসেরই বিষয়। সেজন্যই হয়তো বিখ্যাত এই প্রবাদ– বিশ্বাসে মিলায় স্বর্গ, তর্কে বহু দূর...। সত্যি তা-ই। ধর্ম বিষয়টা বিশ্বাসীদের জন্য বলেই কোরআন মজিদে "হে বিশ্বাসীগণ! হে মানবসকল" বলে মানবজাতিকে সম্বোধন করা হয়েছে।

পরিপূর্ণ বিশ্বাসের ওপর দাঁড়িয়ে আছে ধর্ম। তাই যারা সর্বশক্তিমান স্রষ্টাকে বিশ্বাস করেছেন, তারা না দেখেই করেছেন। পরকালে বিশ্বাস করেন বলেই তারা পৃথিবীতে যা খুশি তা করতে পারেন না। কিয়ামত, শেষ বিচার ইত্যাদি বিষয়গুলো গভীরভাবে বিশ্বাস করেন। আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম কী গভীর বিশ্বাসে লিখেছেন :

"যেদিন রোজ হাশরে করতে বিচার
তুমি হবে কাজী...
সেদিন তোমার দিদার আমি পাবো কি
আল্লাজী ॥

আমি তোমায় দেখে হাজারো বার
দোজখ যেতে রাজি ॥"

যা-ই হোক, শুধু নজরুল নন, রবীন্দ্রনাথ, ওমর খৈয়াম, মির্জা গালিব, মাওলানা রুমী, শেখসাদী (রহ:)– এমন অনেক বিশ্ববিখ্যাত কবি-সাধক ছিলেন গভীরভাবে আস্তিক তথা একেশ্বরবাদী। রবীন্দ্রনাথের মতো কবি লিখলেন 'আমার মাথা নত করে দাও হে প্রভু তোমার চরণ তলে...।' এঁদের মধ্যে রুমী, খৈয়াম, গালিব, শেখসাদীর মত কবিরা ছিলেন পীর বা মুর্শিদে বিশ্বাসী। এক কথায় সুফিবাদে দীক্ষিত প্রেমময় সাধক। সেই প্রেম একদিকে আল্লাহপ্রেম, অন্যদিকে মানবপ্রেমও। এই প্রেমের তাৎপর্যও অতুলনীয়। সেই মানবপ্রেমের শিক্ষা ইসলামে একমাত্র সুফিবাদেই পাওয়া যায়। তাইতো দেখি শেখসাদী (রহ:) এর একটি কবিতার অনুবাদ এরকম:

"তসবিহ আর পাগড়ি দেখে এলাহী ভুলবে না
মানবসেবার পুঞ্জি ছাড়া স্বর্গদুয়ার খুলবে না।" তাহলে কী? শুধু শরিয়তে মুক্তি মিলবে?

মহান সুফিসাধক কুতুববাগীর দরবারে কেন আসবেন, তার উত্তর এরই মধ্যে হয়তো অনেকে পেয়ে গেছেন। তারপরও আরো কিছু প্রশ্ন থেকে যায়। শুধু কি প্রেম পেতে আর প্রেম বিলাতেই এখানে আসি? না, আরো অনেক কিছু এখানে পাওয়া যায়। "সুফিবাদই শান্তির পথ" খাজাবাবা কুতুববাগীর এ মহান বাণীর গূঢ় অর্থ কী? এ প্রশ্নের উত্তরও জানা সম্ভব তাঁর সোহবতে এলেই। কুতুববাগে এলে ইসলামের পরিপূর্ণ আদর্শ শেখা যায়। ডিগ্রিধারী এক শ্রেণির মাওলানা আছেন, আলেম আছেন– যারা সুফিবাদের সমালোচনা করেন, অলি-আল্লাহর মাজার জিয়ারত নাজায়েজ বলেন। এমন কি যাঁকে সৃষ্টি না করলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আঠারো হাজার মাখলুকাত সৃষ্টি করতেন না, সেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স:)-এর শানে দাঁড়িয়ে দরূদ বা মিলাদ শরীফে কেয়াম করাকেও "বেদাত" বলতে এতটুকু বুক কাঁপে না এই আলেমদের। আসলে তাদের দোষ দেয়া যায় না, এ তাদের বদনসিব। তারা ইসলামের প্রকৃত স্বাদ এবং নবীপ্রেম থেকে বঞ্চিত। এই শ্রেণির মাওলানারা শুধু শরিয়ত মানাকেই ইসলাম মনে করেন। কোনো অলির কাছে তারা দীক্ষা গ্রহণ করলে জানতেন, শুধু শরিয়ত ইসলাম নয়, মারেফতের জ্ঞানও লাগে। শরিয়ত, তরিকত, হাকিকত ও মারেফত– এই চারটি বিষয় নিয়েই যে পরিপূর্ণ ইসলাম– সে সত্য কুতুববাগে এলেই প্রাকটিক্যালি শেখা যায়। শুধু থিউরি দিয়ে ইসলাম হয় না। ধর্মের থিউরি অনেক ধর্মতত্ত্ববিদ জানেন, যাদের কেউ কেউ অমুসলিমও রয়েছেন। যারা তরিকত কিংবা মারেফত বোঝেন না বা বুঝতেও চান না, তারা কুলব কী জিনিস, তা কী করে বুঝবেন? মোরাকাবা বা ধ্যান ইংরেজিতে যাকে মেডিটেশন বলে, তা-ই বা জানবেন কেমন করে? অথচ ইসলাম এসেছে মোরাকাবার ভিতর দিয়েই।

> শুধু থিউরি দিয়ে ইসলাম হয় না। ধর্মের থিউরি অনেক ধর্মতত্ত্ববিদ জানেন, যাদের কেউ কেউ অমুসলিমও রয়েছেন। যারা তরিকত কিংবা মারেফত বোঝেন না বা বুঝতেও চান না, তারা কুলব কী জিনিস, তা কী করে বুঝবেন? মোরাকাবা বা ধ্যান ইংরেজিতে যাকে মেডিটেশন বলে, তা-ই বা জানবেন কেমন করে? অথচ ইসলাম এসেছে মোরাকাবার ভিতর দিয়েই।

ইসলামের ইতিহাস পড়লেই জানা যায় আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (স:) পঁচিশ থেকে চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত টানা পনেরো বছর মক্কার হিরা পর্বতের গুহায় বসে গভীর নিমগ্নতায় দিনের পর দিন মোরাকাবা বা ধ্যান করেছিলেন। সেই ধ্যানের মধ্যেই আল্লাহ তাঁর প্রিয় বন্ধুর কাছে জিব্রাইল ফেরেশতার মাধ্যমে ওহি পাঠাতেন। এভাবেই আল্লাহ তাঁর বন্ধু আখেরী নবীকে সর্ববিষয়ে গভীর জ্ঞানী করেছিলেন জিব্রাইলের মাধ্যমে সিনার এলেম পাঠিয়ে। নবুয়ত লাভ তো বটেই, এমন কি পবিত্র কোরআনও নাযিল করেছেন এই ধ্যানের যুগেই। নামাজ-রোজা এসেছে নবুয়তলাভের পরে যখন তিনি মিরাজ শরীফে গেলেন আল্লাহর সঙ্গে দিদারের জন্য। এই মিরাজও তো মোরাকাবার ফলেই সম্ভব হয়েছে। জিব্রাইল (আ:) যে শিক্ষা আল্লাহর নির্দেশে আখেরী নবীকে দিয়েছিলেন, সেই এলেম বা জ্ঞানই সিনার এলেম! এখানেই তো মারেফতের তত্ত্ব লুকিয়ে আছে। আল্লাহর প্রিয় বন্ধু হযরত মুহাম্মদ (স:) কোনো স্কুল, মাদ্রাসা বা কলেজে পড়েছেন? সেকালে তো এমন কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমগ্র আরব জাহানেই ছিলো না। ওই সিনার এলেমের শক্তিতেই সর্ববিষয়ে জ্ঞানী হয়ে বিশ্বনবী বিশ্বজয় করে গেছেন।

প্রেমময় নবীর অনুসারি সাহাবাগণ কীভাবে তাঁকে ভালোবাসতেন, তা বুঝতে হলেও কোনো কামেল মুর্শিদের সান্নিধ্যে যেতে হবে। দেখতে হবে মুরিদরা কীভাবে সেই প্রেমের ঐতিহ্য আজো অনুসরণ করে চলেছেন। মসজিদে নববীর বারান্দায় দিনরাত বসে বসে রাসুলপ্রেমে মশগুল আসহাবে সুফফা ও আহলে সুফফাগণ যে গভীর প্রেমের পরিচয় রেখে গেছেন, তার কোন তুল না নেই। সেই বিশ্বশ্রেষ্ঠ মুর্শিদ বা পথপ্রদর্শকের প্রতি প্রেমের মধ্য দিয়েই মানবপ্রেমের শিক্ষা সুফিরা বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়েছেন। কেন না প্রেমেই শান্তি। তাই খাজাবাবা কুতুববাগী ক্বেবলাজান হুজুর বলেন : 'আল্লাহকে পাওয়ার দুটি পথ– প্রেম আর ইবাদত।' প্রেমের মধ্য দিয়েই সুফিসাধক অলি-আল্লাহগণ বিশ্বময় ইসলামের ভ্রাতৃত্ব, শান্তি আর তৌহিদের অমিয় বাণী প্রচার করেছেন। এই উপমহাদেশে তো ইসলাম এসেছে অলি-আল্লাহদের হাত ধরেই। সুফিরা সংঘাত সমর্থন করেন না। প্রেম দিয়েই তাঁরা অসাধ্য সাধন করেন। সবকিছু জয় করেন। সব মানুষকে ভালোবাসতে শিখান। ধনী-গরিব সবার জন্যে তাঁদের সেবা আর ভালোবাসার দুয়ার খোলা।

এই দৃশ্য দেখতে হলে কুতুববাগ দরবারে আসতে হবে। মানবসেবাই যে পরম ধর্ম, তা-ও এখানে প্রত্যক্ষভাবে শেখা যায়। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, নামাজ শেষে তসবিহ, মোরাকাবা, মোশাহেদা, রাতের শেষপ্রহরে আল্লাহর রহমতের তিন নাম ধরে কান্নাকাটি করে ডাকা, তাহাজ্জুত নামাজ আদায় শেষে ফজরের নামাজ ও তসবিহ-তাহলিল এ সবইতো এই দরবার শরীফে এসে শিখছেন মুরিদরা। সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের ক'জনার নামাজ সহি হয়? যে নামাজে আল্লাহর সঙ্গে দিদার হওয়ার কথা (আসসালাতু মেরাজুল মোমেনিন) সেই নামাজ কীভাবে পড়তে হয়, তা কুতুববাগে না এলে কেমন করে শিখতেন এই দরবারের মুরিদরা? নিমগ্ন চিত্তে আল্লাহকে হাজির-নাজির জেনে চোখ বন্ধ করে সালাত আদায় করা না হলে প্রকৃত নামাজ হয় না। নামাজও এক ধরনের মোরাকাবাব। আত্মশুদ্ধি, দিলজিন্দা, এবাদতে হুজুরি না হলে সব এবাদতই বৃথা। আফসোস, বিপুলসংখ্যক মানুষ ইসলাম ধর্মের এই অনিবার্য শিক্ষার কথা জানেন না। আমরা অনেক ভালো ভালো কথা বলি, বাস্তবে তা পালন করি না। এখানে এলে দেখা যায় বাস্তবেই ভালো কাজ করা সম্ভব। কুতুববাগে চব্বিশ ঘন্টা লঙ্গরখানার চুলায় আগুন জ্বলে, দিন-রাত্রি জাকের মুরিদ ছাড়াও সর্বস্তরের মানুষ এখানে খানা খেতে পারেন। অনেকে আছেন শুধু একটু তবারক খেতেই দরবার শরীফে আসেন। প্রশ্নহীন তারা খেয়ে চলে যান। হাজারো জাকের খেদমত দেন, লক্ষ জাকের খান। শীতে বিনামূল্যে দেয়া হয় বস্ত্রহীনদের জন্য শীতবস্ত্র। এখানে এসে নিষ্ঠুর হয়ে যান দয়ালু। কৃপণও দাতা হন। বেনামাজী নামাজি হন। বেরোজদারী রোজা রাখতে শুরু করেন। শরাবখোর শরাব ছেড়ে দেন। গীবত করা ভুলে যান। কারণ, খাজাবাবার শিক্ষা– বাবারা অন্যের দোষ দেখার আগে নিজের দোষ তালাশ করেন। গীবতের মতো ঘৃণ্য কাজ, পরনিন্দা কেউ করবেন না। বড়কে শ্রদ্ধা করবেন, ছোটকে স্নেহ করবেন, মা-বাবাকে খেদমত করবেন, ক্ষুধার্ত মানুষ পেলে খাওয়াবেন, মা-বোনদের পর্দায় রাখবেন, ইজ্জত দিবেন, নিয়মিত নামাজ পড়বেন, অজিফা আদায় করবেন। সব কিছুতে সবুর করবেন। সবরকারীর সঙ্গে আল্লাহ আছেন। আত্মশুদ্ধির এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসবো না কেন?

লেখক : কবি-সাহিত্যিক, সাংবাদিক
ও কলামিস্ট
খাদেম, কুতুবাগ দরবার শরীফ

মুর্শিদের হুকুম মুরিদের উন্নতির সোপান

মো: শাখাওয়াত হোসেন

পথহারা মানুষকে সঠিক পথে তুলে আনার জন্য, আল্লাহতায়া'লা পৃথিবীতে যুগে যুগে নবী রাসুলদেরকে পাঠিয়েছেন। তাঁরা মহা শান্তিময় সত্যবাণীর আলোকে মিথ্যা দূর করে, মানুষের মধ্যে প্রেম আর সুশৃংখল সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছেন। সবাই জানি হযরত আদম (আ:) থেকে শুরু সর্বশেষ নবী, নবীকূল শিরোমণি রাহমাতাল্লিল আলামিন, হযরত মুহাম্মদ (স:)-এর শুভাগমনের মধ্য দিয়ে সমাপ্তি করা হয়েছে নবুয়তির দরোজা। রাসুল (স:) বলেছেন– আনা খাতামূন নাবীইয়্যিন।' অর্থাৎ : আমিই শেষ নবী, আমার পরে আর কোন নবীর আগমন হবে না।

এখন প্রশ্ন হলো নবুয়তির দরোজা বন্ধ হয়ে গেল, তাহলে কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহতায়া'লার সঠিক পথে চলার দিশা দিবেন কে, বা কারা? মহান স্রষ্টাকে ভুলে সৃষ্টির মোহে মশগুল থাকা পথভ্রষ্ট মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়ে কে ডেকে আনবেন, আল্লাহ-রাসুলের সত্য ইসলামের অমিয় শান্তির ছায়ায়? আল্লাহতায়া'লা নবুয়তির দরোজা বন্ধ করলেও অলি-আউলিয়াদের উপর তাঁর গুণাবলির দিব্যদৃষ্টি সর্বদা জারি রেখেছেন। অলি-আউলিয়াগণই কেয়ামত পর্যন্ত পবিত্র কোরআনের দুইরকম শিক্ষা জাহেরী ও বাতেনী, এই শিক্ষার কল্যাণকর পথে তাঁরা আহ্বান করবেন। এই আলামত যাঁদের মধ্যে পুরোপুরি বিদ্যমান, তাঁরাই হলেন জমানার পথপ্রদর্শক, সত্যপথের সন্ধানদাতা। আল্লাহতায়া'লা পৃথিবীতে চল্লিশ প্রকারের অলি-বন্ধু পাঠিয়ে থাকেন এবং তাঁদেরকে ভিন্ন ভিন্ন স্বকীয় বৈশিষ্ট্য দান করেন।

এই অলিগণের মধ্যে হাদি শ্রেণির অলিদের কাজ সংস্কার করা। মানুষকে আল্লাহতায়া'লার পথে আনা এবং আল্লাহর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া। তাঁরা পবিত্র কোরআনে বর্ণিত নিয়ম-নীতি, আদেশ ও নির্দেশিত শিক্ষা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়ে সত্যিকারের মানুষ হতে সাহায্য করেন। যাঁদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন শুধু তাঁরাই হাদি শ্রেণীর অলির দেখা পাবেন। অনেকে আছেন যাঁরা হয়তো না জেনে, না বুঝে নায়েবে নবী, অলি-আল্লাহ-পীর-ফকিরদের ব্যাপারে ভুল ধারণা করেন। তাই তো তাঁদের প্রতি পবিত্র কোরআনে আল্লাহতায়া'লা বলেছেন– 'ওয়ামাই ইউদলিল্ ফালান তাজিদা লাহু আলিয়্যাম মুরশীদা।' অর্থাৎ যারা পদভ্রষ্ট, তারা কখনও মুর্শিদ বা পীর পাবে না। সুতরাং পবিত্র কোরআনের বর্ণনা মতে– যাদের ভাগ্য ভালো, শুধু তারাই কামেল মুর্শিদের কৃপা-দৃষ্টি পাবেন। মুর্শিদের শিক্ষা-দীক্ষা নিয়ে, তাঁর নির্দেশিত পথে নিজের জীবনকে পরিচালনা করতে পারলে, আত্মাকে পবিত্র করা যায় এবং আত্মাকে পবিত্র করতে পারলেই আল্লাহ ও রাসুল (স:)এর দেখা মিলে।

আমি গোনাহ্গারের মুর্শিদ খাজাবাবা কুতুববাগী ক্বেবলাজান হুজুরের সন্ধান পাওয়ার আগে, নিজের মধ্যে অনেক ভুল ধারণা ছিল। যেগুলো ক্বেবলাজানের দরবারে আসার পরে বুঝতে পেরেছি এবং ভুলগুলো সংশোধনের চেষ্টা করে যাচ্ছি। রাসুল (স:) বলেছেন– আস্ শায়েখু ফি কাওমিহী কান নাবীই ফি উম্মাতি।' অর্থাৎ তোমাদের কওমে যে সাহেবে দাওয়াত পাও, তাঁকে আমি নবী তুল্য মনে কর। অর্থাৎ রাসুলের জমানায় তাঁর সাহাবিরা যেমন করে রাসুল (স:)-এর কথা মান্য করেছেন, ভালোবেসেছেন। তেমনি তোমরাও তোমাদের মুর্শিদ বা পীরের আদেশ-নিষেধ মান্য কর এবং ভালোবাসো। কামেল মুর্শিদের হুকুমের মধ্যেই রয়েছে মুরিদের রহমত-বরকত। যদিও তরিকতের বাহিরে থেকে কিংবা প্রাথমিক পর্যায়ে আমরা তা বুঝতে পারি না।

সম্মানিত পাঠক, এখানে আমি একটি বাস্তব ঘটনার উদাহরণ দিলে, আমার এই লেখার যে শিরোনাম তার মর্ম কথা খুব সহজে বুঝতে পারবেন। আর অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলছি, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ভার এখন আপনাদের হাতে। আমাদের এক জাকের ভাই ইঞ্জিনিয়ার আনোয়ারুল ইসলাম। তাঁর সঙ্গে আমার বেশ ভালো আলাপ পরিচয় আছে। তিনি একটি কোম্পানিতে চাকরি করতেন। হঠাৎ চাকরি চলে যায়। তাঁর স্ত্রীকে চট্টগ্রামে শ্বশুর বাড়িতে রেখে তিনি দরবার শরীফে আসলেন এবং ক্বেবলাজানের কাছে দরবার শরীফে অবস্থানের অনুমতি চাইলেন। ক্বেবলাজান তাঁকে অবস্থানের অনুমতি দিয়ে দরবারে খেদমতে থাকতে বললেন। তখন দরবার শরীফে মহাপবিত্র ওরছ ও বিশ্বজাকের ইজতেমা ২০১৪ এর পুরোদমে আয়োজন চলছে। তিনি আমাদের সঙ্গে মনপ্রাণ দিয়ে খেদমত করতে লাগলেন।

একটি বাস্তব ঘটনার উদাহরণ দিলে, আমার এই লেখার যে শিরোনাম তার মর্ম কথা খুব সহজে বুঝতে পারবেন। আর অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলছি, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ভার এখন আপনাদের হাতে। আমাদের এক জাকের ভাই ইঞ্জিনিয়ার আনোয়ারুল ইসলাম। তাঁর সঙ্গে আমার বেশ ভালো আলাপ পরিচয় আছে। তিনি একটি কোম্পানিতে চাকরি করতেন। হঠাৎ চাকরি চলে যায়। তাঁর স্ত্রীকে চট্টগ্রামে শ্বশুর বাড়িতে রেখে তিনি দরবার শরীফে আসলেন এবং ক্বেবলাজানের কাছে দরবার শরীফে অবস্থানের অনুমতি চাইলেন। ক্বেবলাজান তাঁকে অবস্থানের অনুমতি দিয়ে দরবারে খেদমতে থাকতে বললেন।

১৪ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার ওরছ শরীফ শেষ হলো। জাকেরকর্মী ভাইজানেরা অনেকে বাবাজানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বাড়িঘরে গেছেন কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার আনোয়ারুল ইসলাম ভাই গেলেন না। এর বেশ কয়েকদিন পর হঠাৎ এক রাতে নয়টা সাড়ে নয়টা বাজে, তখন বাবাজান তাঁকে ডেকে বললেন, বাবা, আপনাকে ছুটি দিলাম। এক্ষুনি আপনি বাড়ি চলে যান। ক্বেবলাজানের হুকুম পেয়ে তিনি হতবিহ্বল হয়ে পড়লেন এবং মনে মনে চিন্তা করলেন, আমার নিশ্চয়ই কোন ভুল হয়েছে, তাই বাবাজান আমাকে দরবার শরীফ থেকে এই মুহূর্তে বাড়ি চলে যেতে বললেন। ঘটনার সময় আমি গুনাহ্গার সেখানে উপস্থিত ছিলাম কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। পীরের হুকুম মাথায় নিয়ে তিনি ওই রাতেই সরাসরি চট্টগ্রামে তাঁর শ্বশুর বাড়ি চলে গেলেন।

বাড়িতে ঢোকার আগেই বাহিরে দেখতে পেলেন অনেক লোকজন। কিছুই বুঝতে পারলেন না ব্যাপার কি। বাড়ির ভিতরে ঢুকে বুঝলেন কারো বিয়ের আয়োজন চলছে। তাঁকে দেখে সবাই জিজ্ঞেস করলো, তুমি কোত্থেকে এসেছো? স্ত্রীর বড় ভাই বললো, আমার বোনকে কোন বেকার ছেলের কাছে আর দিব না। তাই বিয়ে দিচ্ছি। তুমি চলে যাও। নিজের স্ত্রীকে অন্যত্র বিয়ে দিচ্ছে দেখে তিনি যেন আকাশ থেকে পড়লেন! উপস্থিত মেহমান ও লোকজনের জটলা তৈরি হল। এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ আসলেন। তাঁদের কাছে ইঞ্জিনিয়ার আনোয়ার ভাইজান বললেন, আমার স্ত্রী যদি আমার সঙ্গে থাকতে না চায়, তাহলে আমার কোন আপত্তি নেই। তাঁর স্ত্রীকে ডাকা হল, তিনি বললেন– আমার অমতে অন্যত্র বিয়ে দেয়া হচ্ছে। ইঞ্জিনিয়ার আনোয়ার ভাইজান বললেন– আমি শ্বশুর বাড়ির লোকজনের কাছে কয়েক লাখ টাকা পাই। সেই টাকা আত্মসাৎ করার জন্যেই জোর করে আমার স্ত্রীকে অন্যত্র বিয়ে দিচ্ছে। এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এই ঘটনার সত্যতা জানার পর ওই পরিবারের কাছ থেকে তাঁর পাওনা টাকা আদায় করে স্ত্রীকে সঙ্গে দিয়ে দিলেন। তিনি ওখান থেকে নিজের বাড়ি চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে গেলেন এবং ওই টাকা দিয়ে ব্যবসা শুরু করলেন। বর্তমানে মুর্শিদ ক্বেবলাজান খাজাবাবা কুতুববাগীর দোয়ার বরকতে তাঁর পরিবারের সবাইকে নিয়ে সুখে শান্তিতে আছেন। মোবাইল ফোনে তাঁর মুখে এই ঘটনা শুনে আমি বুঝতে পারলাম, ক্বেবলাজান হুজুর কেনো সেদিন তাঁকে হঠাৎ ছুটি দিয়েছিলেন। শ্বশুর বাড়ি পৌঁছাতে যদি আর মাত্র কয়েক ঘন্টা দেরি হতো, তাহলে কত বড় একটা অঘটন ঘটে যেতে বসেছিল।

ইঞ্জিনিয়ার আনোয়ারুল ইসলাম ভাইজানের জীবনে ঘটে যাওয়া এমন সত্য ঘটনার মধ্য দিয়েও বুঝা যায় যে, সুফিদের প্রতিটি নির্দেশের মধ্যেই মুরিদের জাহেরি ও বাতেনি উন্নতির ইঙ্গিত নিহিত থাকে। আল্লাহ তাঁর অলি-বন্ধুদেরকে পবিত্র কোরআনের দুই প্রকার এল্‌ম জাহের (প্রকাশ্য) ও বাতেন (গোপন) দান করেছেন। যার মাধ্যমে তাঁরা হন দিব্যজ্ঞানী। দিব্যদৃষ্টি দিয়ে তাঁরা মানুষের অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দেখতে পান এবং সবকিছুর বিষয়ে অসীম জ্ঞান রাখেন। তাঁর মুরিদ-সন্তানদের শরিয়ত ও মারেফতের শিক্ষায় শিক্ষিত করে সাধারণ মানুষ থেকে অসাধারণ মানুষে পরিণত করেন।

বাতেনী জ্ঞান

শেষ পৃষ্ঠার পর

কয়েন ছুড়ে দেয়া হলে সেই সিকি তলিয়ে যাবে এবং তা খুঁজে পাওয়া যাবে না। তেমনি মোরাকাবা বা ধ্যানের মধ্যে যে জ্ঞান রয়েছে, তা ওই সাগর সমতুল্য, যেখানে বইপুস্তকের জ্ঞানের বড় বড় ডিগ্রি ছুড়ে ফেললে তা আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

কিছুদিন আগে আমার এক আত্মীয় অনেকটা তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন, তুমি তো ইঞ্জিনিয়ার, তুমি যে পীরের কাছে যাও উনি কি তোমার চেয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং বেশি জানে? আমি বলেছিলাম, শুধু ইঞ্জিনিয়ারিং না, তিনি যেকোন বিষয়েই গভীর জ্ঞান রাখেন, বিশদভাবে জানেন ও সঠিক চিন্তায় সহজেই বুঝেন। তখন আমার আত্মীয়ের চেহারা দেখে মনে হল উনি ভাবছেন, ছেলেটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। এই ধরনের কথা শোনার অভিজ্ঞতা আমার অনেকবার হয়েছে। আমিও একসময় তা-ই ভাবতাম, যখন পর্যন্ত আল্লাহতায়া'লা আমাকে এই কামেল অলির সান্নিধ্যে আনেননি। আমার গুরু, আমার পীর-মুর্শিদ যখন বলতেন, বাবা জ্ঞান দুই প্রকার, একটা জাহেরী, অন্যটা বাতেনী জ্ঞান। জাহেরী জ্ঞান সীমিত। কিন্তু বাতেনী জ্ঞানের কোনো সীমা পরিসীমা নেই।

সত্যি কথা বলতে কি আমি তরিকায় আসার প্রথম দিকে খাজাবাবা কুতুববাগী ক্বেবলাজান হুজুরের পবিত্র মুখে বিভিন্ন বিষয়ের উপর জ্ঞানগর্ভ অনেক আলোচনা শুনতাম। কিন্তু বুঝতাম না। এই মহান গুরু বা শিক্ষকের সান্নিধ্যে থেকে ধীরে ধীরে তাঁর অসীম দয়ায় কিছু কিছু বোঝার সুযোগ হয়েছে। এ জ্ঞান শুধু বস্তুজগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, অতিন্দ্রিয় জগতের সঙ্গে যার যোগাযোগ, যে জ্ঞান দ্বারা অসম্ভব কাজ সম্ভব হয়ে যায়। অনেক মানুষ আছেন যাঁরা কোরআন-হাদিস গবেষণা করছেন, আবার তাঁরা অন্যের সম্পর্কে অবলীলায় গীবত করে বেড়াচ্ছেন। যা কিনা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। তাই এ সম্পর্কে মহান সৃষ্টিকর্তা পরম করুণাময় আল্লাহতায়া'লা পবিত্র কোরআনে সবাইকে কঠিনভাবে সতর্ক করেছেন। রাসুলুল্লাহ (সঃ) বাস্তবে সাহাবা কেরামদের শিখিয়েছেন কীকরে গীবতের মত এতো বড় ক্ষমাহীন গুনাহ্ থেকে মুক্ত থাকা যায়। যুগে যুগে জমানার আউলিয়া, মোজাদ্দেদগণ তারই প্রতিফলন ঘটিয়ে সুশিক্ষার আলোয় মুছে দেন কলুষিত আত্মার ভ্রান্ত অন্ধকার।

আমি অত্যন্ত মূর্খ মানুষ। কোরআন হাদিস কিছুই পড়িনি। কিন্তু আমার মুর্শিদ-গুরু শিখিয়েছেন, কোনো মানুষ সম্পর্কে অনুমানে কিছু বলা মানেই গীবত। কারণ, তুমি অনেক কিছুই জানো না। একমাত্র আল্লাহতায়া'লাই জানেন ও সব খবর রাখেন। গীবত করা মহা পাপ। আমি অধম দাবি করি না যে, আমি গীবত করি না। আমিও করি অনেক সময়। কিন্তু বর্তমানে সরাসরি গীবতকারীদের থেকে পার্থক্য হল যে, এখন পরচর্চা করতে গেলেই ভিতর থেকে যেন কে বলে ওঠে, তোমার কথায় গীবত হচ্ছে! তখন নিজেকে সংশোধন করতে চেষ্টা করি। এই যে পরিবর্তন এটা বাতেনী শিক্ষা। এই শিক্ষার জ্ঞান লাভ করা সম্ভব শুধু আল্লাহর একজন কামেল অলি-বন্ধুর সান্নিধ্যে রুহানী তাওয়াজ্জুহ্ বলে। অনেকে বলেন, অলিআল্লাহ আবার কি? এই রকম আবার আছে নাকি! মানুষ সবাই সমান। আমি বলি আছে ভাই, আছে। কিছু মানুষ আছেন যাঁরা অসাধারণ। এখানে অসাধারণ বলতে আমি ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বুদ্ধিজীবী, গবেষক, পণ্ডিত, কবি, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানীদের কথা বলছি না। বলছি, এ সব জ্ঞানের উপরে যে জ্ঞানের জগৎ আছে, সেই জ্ঞানের অধিকারী অসাধারণ ব্যক্তিত্বদের কথা। যাঁদের এক নজর দেখলেই মনে হবে অসাধারণ! তখন তাঁকে আর মাপকাঠিতে ওজন করার প্রয়োজন হয় না।

আমরা তো সব বিচার বিবেচনা করি আমাদের সীমিত সাধারণ জ্ঞান দিয়ে। এটা করতে পেরেই মনে হয় আমি সেরা। আমার কোনো দোষ নেই। আমরা নিজেকে বাদ দিয়ে অন্য মানুষের দোষ খুঁজি। কিন্তু আমার মুর্শিদ-গুরু আমাকে শিখালেন অন্যের দোষ তালাশ করার আগে নিজের দোষ তালাশ কর। তোমার নিজের ভিতরেই কত দোষ। তুমি কেনো অন্যের দোষ খুঁজতে যাও। নিজের ভিতরে যে ছয় রিপুর ছয়টি দানব আছে, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর এবং তাদের পরাজিত কর। এই রিপুগুলোকে দমন করতে পারলেই তোমার আত্মা শুদ্ধ হবে এবং আত্মা শুদ্ধ হলেই দিল জিন্দা (জাগ্রত) হবে। যখন এই স্তর পার করতে পারবে তখনই আসবে নামাজে হুজুরী। নামাজে হুজুরী বা একাত্মতা ছাড়া কোনো নামাজই আল্লাহর দরবারে পৌঁছে না এবং তা কবুল হয় না। এত সুন্দর মূল্যবান কথা আমি খাজাবাবা কুতুববাগী ছাড়া অন্য কারো কাছে কখনো শুনিনি।

বাতেনী জ্ঞান লাভ করতে হলে প্রথমে ছাড়তে হবে আমিত্ব-অহঙ্কার, আমি সব জানি, সব বুঝি, আমি মহাজ্ঞানী– এমন চিন্তাভাব চিরদিনের মত ত্যাগ করতে হবে। কারণ কোন একটা খালি পাত্র ভালো-মন্দ যেকোন জিনিস দিয়েই পূর্ণ করা যায়। কিন্তু মূল্যহীন জিনিসপত্র দিয়ে ভরে কোন ফল হবে না। ঠাসা কোন পাত্র সেখানে মূল্যবান জিনিস দিলেও তাতে ধরবে না। তাই ওই সমস্ত অহঙ্কারের গলা টিপে আমিত্বের অহমিকা হত্যা করে নিজেকে অহঙ্কারশূন্য পাত্রে পরিণত করতে পারলেই বাতেনী জ্ঞানে তা পরিপূর্ণ হয়ে যায়।

ছোটবেলা থেকেই শুনে আসছি নামাজ পড়। নামাজ না পড়লে গুনাহ্ হবে, অমুক শাস্তি, তমুক শাস্তি হবে। এ সব ভয় ভীতির কথা আমার মনে কখনো দাগ কাটতো না। আমার মুর্শিদ-গুরুর কাছে শুনলাম, শুধু ভয় দিয়ে কিছু হবে না। ভয়ের সঙ্গে প্রেম না থাকলে তাতে কোনো কাজ হয় না। এই প্রথম ভালো লাগল। আরো শুনলাম, মহান আল্লাহতায়া'লা অতি দয়ালু এবং মহান আল্লাহর সঙ্গে প্রেম হলেই কেবল ইবাদত-প্রার্থনায় আনন্দ পাওয়া যায়। এখন কথা হল যাঁকে দেখিনি, তাঁর সঙ্গে প্রেম হবে কেমন করে? এ প্রশ্নের উত্তর জানার পর থেকে এই প্রথম নামাজ আদায় করে স্বাদ-মজা পেলাম।

মনের ভিতর যখন কারো জন্য প্রেম উদয় হয়, তখন তার কথাই শুধু মনে পড়ে। তখন অন্য কিছুই আর গভীরভাবে মনে আসে না। তেমনি নিজের মনে আল্লাহর জন্য যখন প্রেম আসবে, তখনই কেবল খেয়াল আল্লাহর দিকে থাকবে। অন্যথায় সারাজীবন নামাজ পড়লাম কিন্তু খেয়াল থাকে চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য, ধন দৌলতসহ দুনিয়ার বিভিন্ন চাহিদার প্রতি। এই নামাজের কি কোন সুফল আছে? এক কথায় উত্তর– নেই। এই উপলব্ধি যখন নিজের ভিতরে আসবে, শুধু তখনই বুঝা যাবে যে, আমার হুজুরী দিলে কবুলিয়াতের নামাজ হচ্ছে কি-না। তার আগে শোনা কথার অর্থ শুধু অন্যের মুখে ঝাল খাওয়ার মতো। তাতে কোনো লাভ নেই।

আরেকটা কথা বলে শেষ করি, বাতেনী জ্ঞান লাভ করতে হলে প্রথমে ছাড়তে হবে আমিত্ব-অহঙ্কার, আমি সব জানি, সব বুঝি, আমি মহাজ্ঞানী– এমন চিন্তাভাব চিরদিনের মত ত্যাগ করতে হবে। কারণ কোন একটা খালি পাত্র ভালো-মন্দ যেকোন জিনিস দিয়েই পূর্ণ করা যায়। কিন্তু মূল্যহীন জিনিসপত্র দিয়ে ভরে কোন ফল হবে না। ঠাসা কোন পাত্র সেখানে মূল্যবান জিনিস দিলেও তাতে ধরবে না। তাই ওই সমস্ত অহঙ্কারের গলা টিপে আমিত্বের অহমিকা হত্যা করে নিজেকে অহঙ্কারশূন্য পাত্রে পরিণত করতে পারলেই বাতেনী জ্ঞানে তা পরিপূর্ণ হয়ে যায়।

আমরা দুই পাতার জ্ঞান অর্জন করেই ভাবতে শুরু করি, আমি অনেক জানি, আমি অনেক জ্ঞানী। কিন্তু আসলে বাতেনী জ্ঞান যখন নিজের ভিতর আসতে শুরু করবে, তখন শুধুই মনে হতে থাকবে, আমি কিছু জানি, আমি বা আমার বলতে কিছুই নেই। এই ভাব, এই জ্ঞান কামেল মুর্শিদের সাক্ষাৎ ছাড়া অর্জনের কোনো রাস্তা নেই। এখন শুধু মনে হয়, জীবনের এতগুলো বছর শুধু অকারণে অবহেলায় কেটে গেল। নিজেকে শুদ্ধ করার কাজ কিছুই হল না। কখন জানি পরপারের ডাক এসে নিভিয়ে দিবে পৃথিবীর আলো, পাড়ি জমাতে হবে অচেনা-অদেখা অন্ধকার দেশের উদ্দেশে। এরপর কি আর হবে এমন মানব জন্ম।

তাসাউফ-তরিকত-পীর

শেষ পৃষ্ঠার পর

কর্ম পদ্ধতি : মাশায়েখগণ যুগে যুগে শান্তির পথহারা মানুষকে প্রকৃত মুরিদে মুমিন হিসেবে পরিচালনা করা ও পরিচালিত হওয়ার জন্য সুবিন্যস্ত কর্ম পদ্ধতি আল্লাহ-রাসুলের পক্ষ থেকে নির্ধারণ করেছেন। এ কর্ম পদ্ধতি যথাযথভাবে অনুসরণের মধ্য দিয়ে বান্দা তার মন্‌জিলে মকছুদ, অর্থাৎ অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে। তাই মানুষের মৌলিক জীবনঘনিষ্ঠ এ কার্যক্রম পৃথিবীর নানা দেশে তরিকত ও সিলসিলা নামে পরিচিত। এর মাধ্যমে মুসলমানগণ মহানবী (সঃ)-এর মহব্বতে তাঁর দর্শন লাভ করতে পারেন। এ কথা পবিত্র কোরআন-হাদিস দ্বারা প্রমাণিত এবং স্বীকৃত যে, শতবর্ষ পর পর বেলায়েতে মাশায়েখগণ নবীর প্রতিনিধি হয়ে আসবেন। তাঁদের কর্ম থাকবে আল্লাহ-রাসুলের আলোকিত সত্য পথের নেশা ও অপরিসীম জ্ঞানের ভান্ডার এবং থাকবে আধ্যাত্মিক শক্তি, যে শক্তি মানুষের সার্বিক কল্যাণে নিবেদিত।

পীর-মুরিদী : তরিকতের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রতিটি সিলসিলাতে আল্লাহর মনোনীত একের পর এক আধ্যাত্মিক মহাপুরুষ তাঁর অনুসারীদের পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁদের দ্বারা প্রচারিত ইসলামের সত্য বাণী গ্রহণ করে দিকভ্রান্ত অসহায় মানুষ সুপথে আসার সুযোগ পেয়ে খাঁটি ঈমানদার হয়ে, সুবিন্যস্ত জীবন-যাপনের মাধ্যমে মহান আল্লাহর স্বাদ গ্রহণ করে মৃত্যুবরণ করতে পারেন। এই পথের প্রদর্শককে শাইখ বা পীর-মুর্শিদ এবং তাঁদের অনুসারীকে মুরিদ বা শাগরেদ বলা হয়। পীরের ইন্তেকালের পর তরিকতের কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য, পীরের আদেশে প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালনকারীকে খলিফা বলা হয়। মাশায়েখ কেরামগণ যাঁকে মনোনীত করেন, তিনিই পরবর্তীতে শাইখ হিসেবে বিবেচিত হন। এ দায়িত্ব অর্পণ ও মনোনয়ন আধ্যাত্মিক যোগ্যতার ভিত্তিতেই হয়ে থাকে। আধ্যাত্মিকতা উত্তরাধিকার সুত্রে পাওয়া যায় না, এ গুণ আল্লাহতায়া'লার দান এবং যা নির্মল সাধনার বলে অর্জন করতে হয়। এখন পর্যন্ত এ নীতিই অনুসৃত হয়েছে, ফলে প্রকৃত তাসাউফ ও রূহানিয়াতের বিদ্যাচর্চা যাঁদের মধ্যে অক্ষুণ্ন পরিপূর্ণ। তাঁদের সান্নিধ্য শিক্ষায় এসে মুসলমানরা প্রকৃত ঈমানদার ও আধ্যাত্মিক সাধনায় উৎকর্ষ লাভ করছেন।

পীর যোগ্যতা সম্পন্ন হতে হবে : পীর-মুর্শিদ হলেন তরিকতের পরিচালক। এখানে বলে রাখি, পীর পরিপূর্ণ যোগ্যতা সম্পন্ন না হলে, সঠিকভাবে তরিকত পরিচালনা করে মুরিদদের সত্যের পথ প্রদর্শন করতে পারেন না। অযোগ্য পীরের মুরিদ হলে নিজের বিশ্বাস, ভক্তি কোনটাই রক্ষা করা মুরিদের পক্ষে সম্ভব না। তাই ঈমানহারা হয়ে মরে যাওয়ার আশংকা থাকে। কারণ মৃত্যুমুহূর্তে আজরাঈলের বিকটময় চেহারা দেখলে দুর্বল ঈমানের মানুষ আল্লাহ-রাসুলের স্মরণ সবই ভুলে যাবে। সেই সুযোগে মানুষের ঈমান শয়তান দখল করে নিবে।

তাফসিরে কবীর এর রচয়িতা বিশ্বখ্যাত মোফাসসিরে কোরআন আল্লামা হযরত ফখরুদ্দীন রাজী (রহ.)-এর মৃত্যু শয্যায় শয়তানের সঙ্গে তর্কে লিপ্ত হন। ফখরুদ্দীন রাজী মৃত্যু শয্যায় শয়তানের বেড়াজালে পড়লেন! তখন নিজের যোগ্যতায় তিন'শ ষাটটি দলিল উপস্থাপন করলো যে, লা-শারিক, আল্লাহ এক'। তবুও শয়তানের সঙ্গে পেরে উঠছিলেন না, তখনই তাঁর যোগ্যতা-সম্পন্ন পীর-মুর্শিদ হযরত শাইখ নাজিমুদ্দীন কোবরা (রহ.) প্রায় তিন'শ মাইল দূর থেকে রুহানিভাবে দেখতে পেলেন, তাঁর ভক্ত-মুরিদ ফখরুদ্দীন রাজী মৃত্যু শয্যায় শয়তানের ধোকায় পড়তে যাচ্ছে। তখন তিনি অজুর পানির ঘটি নিক্ষেপ করলেন, পানিসহ ঘটি এসে ফখরুদ্দীন রাজীর গায়ে পড়লো। ঘটির ভিতর থেকে আওয়াজ আসল– হে ফখরুদ্দীন রাজী, তুমি শয়তানকে বলো, বিনা দলিলে আমার প্রভু এক' এবং বিশ্বাস করি তিনি অবিনশ্বর।' ইমাম ফখরুদ্দিন রাজী (রহ.)-এ কথা শয়তানকে বললে, শয়তান পরাজিত হয়ে বললো– হে ফখরুদ্দীন রাজী, যদি আজ তোমার কোন কামেল পীর-মুর্শিদ না থাকতো তাহলে তুমি কিছুতেই ঈমান নিয়ে কবরে যেতে পারতে না। এভাবেই শয়তানের কবল থেকে ফখরুদ্দীন রাজীর ঈমান রক্ষা পেল। এ ঘটনা থেকে প্রমাণিত হলো যে, মুরিদ যতই যোগ্যতা-সম্পন্ন, কেতাবি আলেম হোক না কেনো। যোগ্য পীরের সান্নিধ্য না পেলে তাঁর নিজস্ব যোগ্যতা অনেক সময়ই বেকার প্রমাণিত হয়। (চলবে)

লেখক : মৌলানা শামশুল আলম আজমী, কক্সবাজার থেকে

আমার দিকে যে ব্যক্তি রুজু হয়েছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসরণ কর
–আল কোরআন

আত্মার আলো

সুফিবাদের মুখপত্র মাসিক আত্মার আলো পড়ুন ও সংগ্রহে রাখুন

মাসিক আত্মার আলো'র গত সংখ্যাগুলো যাদের সংগ্রহে নেই তারা সরাসরি ৩৪ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকার দরবার শরীফের নিচতলায় নিজস্ব লাইব্রেরি থেকে অথবা ডাক যোগে সংগ্রহ করতে পারেন। কারণ, প্রতি সংখ্যায় পবিত্র কোরআন-হাদিসের আলোকে খাজাবাবা কুতুববাগী ক্বেবলাজান হুজুর সুফিবাদ সম্পর্কে কোরআন-হাদিসের অন্তর্নিহিত বিষয় খুব সহজভাবে বিশদ আলোচনা লিখে থাকেন। এছাড়াও সম্মানিত আশেক-জাকের ভাই-বোনেরা তাঁদের নিজ নিজ অভিজ্ঞতা, অনুভুতি ও প্রাপ্তির সত্য ঘটনা লিখে থাকেন। যে কেউ নিয়মিত পড়লে অবশ্যই তার মধ্যে শরিয়ত এবং মারেফতের জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে এ আমাদের বিশ্বাস।

সম্মানিত পাঠক ভাই-বোনেরা, আত্মার আলো পত্রিকায় কুতুববাগী ক্বেবলা ক্বেবলাজান হুজুরের লেখা তাসাউফ তথা সুফিবাদের মতবাদ, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ অন্য লেখক ভাই-বোনদের লেখা পড়ে আপনাদের ভালো লাগা, মন্দ লাগা বা যেকোন মতামত কিংবা শরিয়ত, তরিকত, হাকিকত ও মারেফত কী, এবং কেনো? মানুষের জীবনে এর প্রয়োজন কী? তাসাউফ-সুফিবাদ কী? এ ব্যাপারে জানার জন্য যেকোন প্রশ্ন লিখে পাঠাতে পারেন ডাক, কুরিয়ার অথবা ই-মেইলে। আপনাদের মূল্যবান লেখা, মতামত ও প্রশ্নের উপযুক্ত উত্তরসহ 'মাসিক আত্মার আলো' পত্রিকায় গুরুত্বের সাথে প্রকাশ করা হবে। এ বিষয়ে আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দিবেন কুতুববাগ দরবার শরীফের পীর-মুর্শিদ খাজাবাবা কুতুববাগী ক্বেবলাজান হুজুর।

পূর্ণনাম ঠিকানাসহ লিখুন এই ঠিকানায় :

বরাবর
সম্পাদক
মাসিক আত্মার আলো
কুতুববাগ দরবার শরীফ
৩৪ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা।
Email : masikattaralo@gmail.com
ভিজিট করুন : www.kutubbaghdarbar.org.bd

আত্মার আলোর এ যাবত প্রকাশিত ৭টি সংখ্যায় খাজাবাবা কুতুববাগী ক্বেবলাজান হুজুরের কয়েকটি লেখার শিরোনাম দেয়া হলো

এপ্রিল ২০১৪ প্রথম সংখ্যা :
- খাজাবাবা শাহসুফি হযরত জাকির শাহ এর সংক্ষিপ্ত জীবনী।
- সুরা ফাতেহার অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

মে ২০১৪ দ্বিতীয় সংখ্যা :
- ইসলাম ধর্মে যতপ্রকার প্রার্থনা, আরাধনা, উপাসনা, রিয়াজত, সাধনা, জিকির-আজকার যা কিছু আছে, তার মধ্যে নামাজই সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত
- সুরা মাউন, ১ থেকে ৭ নং আয়াত পর্যন্ত তরজমা
- কোরআন-হাদিস মতে ছদকা এবং মান্নতের বিধান
- কোরআন-হাদিস মতে অবশ্যই কামেল পীর-মুর্শিদ ধরতেই হবে

জুন ২০১৪ তৃতীয় সংখ্যা :
- মহা নবীর নূরেই জগৎ সৃষ্টি
- মোরাকাবা কোরআন-হাদিসের দলিলে নির্ভুল প্রমাণিত
- লাইলাতুল বরাতের গুরুত্ব

জুলাই ২০১৪ চতুর্থ সংখ্যা :
- শরিয়তের দৃষ্টিতে ছবি রাখার বিধান
- রহমত, বরকত ও নাজাতের মাস পবিত্র মাহে রমজান
- গীবতকারীদের সম্পর্কে কোরআন-হাদিসে কঠোর হুঁশিয়ারি
- কামেল পীর-মুর্শিদকে বাবা বলার অকাট্য দলিল

আগস্ট ২০১৪ পঞ্চম সংখ্যা :
- আল্লাহতায়া'লা নিজেই ফেরেস্তাদের নিয়ে নবীজির প্রতি দরুদ-সালামের মজলিশ করেছেন
- শালিনতার ভিতরেই আধুনিকতা

সেপ্টেম্বর ২০১৪ ষষ্ঠ সংখ্যা :
- আল্লাহতায়া'লা কোরআন মজিদে তাঁর বন্ধু-অলি-আউলিয়াদের ব্যাপারে সাধারণ মানুষদের সতর্ক করেন
- কুতুববাগী ক্বেলাজান হুজুরের মহা মূল্যবান নসিহতবাণী

অক্টোবর ২০১৪ সপ্তম সংখ্যা :
- মহান আল্লাহতায়া'লা আদম সৃষ্টির আগে ফেরেস্তাদের সঙ্গে পরামর্শ করেন
- শরিয়তের জ্ঞান ছাড়া কেউ ওয়ারেছাতুল আম্বিয়া হতে পারবেন না
- সদকায়ে জারিয়া : মাতা-পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনার উপকারীতা

তাসাউফ-তরিকত-পীর ও মুরিদ

মৌলানা শামশুল আলম আজমী

ইসলাম ধর্মে আধ্যাত্মিকতার সূচনা অর্থাৎ ইলমে তাসাউফের ধারাবাহিকতা কখন কীভাবে শুরু হলো, তা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এর উত্তরও অতি স্পষ্ট যে, ইসলাম ধর্মে রূহানিয়াত অর্থাৎ আধ্যাত্মিকতার সূচনা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর মাধ্যমে সাহাবা কেরামদের মধ্যেই প্রথমে বিস্তার হয়েছে। মহানবী (সঃ) এবং তাঁর সাহাবীগণ পার্থিব বিষয়ের প্রতি আগ্রহী ছিলেন না। আত্মপ্রচার ও লোক দেখানো তাঁদের জীবনে কখনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়নি। তাঁদের মূল ব্রত ও একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল মহান স্রষ্টাকে সন্তুষ্ট করা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে তাঁদের জীবন উৎসর্গ করা।

তাসাউফের সূচনা : মহানবী (সঃ)-এর প্রতি দৃষ্টি দিলে দেখা যায়, তিনি প্রাথমিক জীবনের একটি বিরাট অংশ লোকাচার-লোকনিন্দা উপেক্ষা করে পার্থিব জীবনের সুখ-শান্তি ত্যাগ করে হেরা পর্বতের নির্জন গুহায় আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। কিন্তু তখনো তাঁর উপর অহী নাজিল শুরু হয়নি। মহানবী (সঃ)-এর উপর অহী অবতরণের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক মিশন অর্থাৎ ইলমে তাসাউফের শিক্ষার ব্যাপকতা শুরু হয়। তাঁর সঙ্গে এ মিশনে যাঁরা সম্পৃক্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে হযরত আবু বকর ছিদ্দীক, হযরত ওমর বিন খাত্তাব, হযরত ওসমান জিন্নূরাইন, হযরত মওলা আলী এবং তাঁদের সমসাময়িক অন্য সাহাবা কেরামের জীবন কর্ম মূল্যায়ন করলে দেখা যায়, তাঁরা প্রত্যেকেই আধ্যাত্মিক মহাপুরুষ হিসেবে নিজেদের জীবন যৌবন, ধন-দৌলত, পরিবার-পরিজন, ধ্যান-ধারণা সবকিছু মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সন্তুষ্টির জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। মহানবী (সঃ) সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন ও তাবে তাবেঈনের যুগ 'খাইরুল কুরুন', অর্থাৎ : তাসাউফ ও রূহানিয়াত-এর স্বর্ণযুগ হিসেবে বিবেচিত।

তাসাউফের বিস্তার : আল্লাহতায়া'লার মনোনীত ধর্ম পবিত্র ইসলাম এবং শুধু এ ধর্মেই রয়েছে মানবজাতির জন্য পরিপূর্ণ জীবন-বিধান। একথা পবিত্র কোরআন ও হাদিসে বর্ণিত আছে এবং জাগতিক গবেষণা ও পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমেও এ সত্য প্রমাণিত হয়েছে। ইসলামের ধারাবাহিকতা ক্বিয়ামত পর্যন্ত বহমান থাকবে। এ ধর্মের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রকারের ষড়যন্ত্র হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে। কিন্তু

> মাশায়েখগণের মাধ্যমে এখনো সমগ্র বিশ্বে প্রকৃত ইসলামের চর্চা অবিকৃত অবস্থায় বিরাজমান। হযরত ওমর বিন আবদুল আজিজ ১০১ হিজরীতে ইন্তেকাল করার পর মুসলিম রাজা বাদশাগণ ইসলাম ধর্মের আধ্যাত্মিকতাকে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠ-পোষকতা প্রদানে সক্ষম হননি। কারাবালার ইয়াজিদ অনুসারীদের হাতে মহানবীর প্রাণপ্রিয় দৌহিত্র ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন (রাঃ) আনহুমার শাহাদাতের মধ্য দিয়ে ইসলাম দু'টি ধারায় বিভক্ত হয়ে গেছে।

তাসাউফ তথা আধ্যাত্মিকতার কারণেই এ ধর্মের অস্তিত্ব অটল ও অবিচল আছে এবং থাকবে। তবে তাবেঈনদের পর থেকে হক্কানী রব্বানী পীর মাশায়েখগণের মাধ্যমে এখনো সমগ্র বিশ্বে প্রকৃত ইসলামের চর্চা অবিকৃত অবস্থায় বিরাজমান। হযরত ওমর বিন আবদুল আজিজ ১০১ হিজরীতে ইন্তেকাল করার পর মুসলিম রাজা বাদশাগণ ইসলাম ধর্মের আধ্যাত্মিকতাকে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠ-পোষকতা প্রদানে সক্ষম হননি। কারাবালার ইয়াজিদ অনুসারীদের হাতে মহানবীর প্রাণপ্রিয় দৌহিত্র ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন (রাঃ) আনহুমার শাহাদাতের মধ্য দিয়ে ইসলাম দু'টি ধারায় বিভক্ত হয়ে গেছে। একটি সুন্নত বিরোধী ও তরিকত বিরোধী এজিদি ইসলাম, অন্যটি হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর অনুসারী আওলাদে রাসুলদের পথের ইসলাম। এই বৈরিতা সত্ত্বেও কিন্তু মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় ও মনোনীত অলিবান্দা, পীর, ফকির, গাউছ-কুতুব, হক্কানী আলেম ওলামা ও মাশায়েখের মাধ্যমেই এ রূহানী কার্যক্রম এখনো পর্যন্ত বিরাজমান রেখেছেন। পরবর্তীতে এ কর্মকাণ্ড 'তরিকত' নামে পরিচয় লাভ করে। তরিকতের অর্থ হলো, রাস্তা-পথ, পন্থা, পদ্ধতি, রীতি-নীতি বা মাধ্যম। যেমন কাদরীয়া তরিকা, চিশতিয়া তরিকা, নকশবন্দিয়া তরিকা এবং সর্বশেষ মোজাদ্দেদিয়া তরিকা। এই চারটি তরিকা যা ভিন ভিন্ন সময়ের বা যুগের শ্রেষ্ঠ একেকজন মহা মানবের মাধ্যমে আর্বিভূত হয়েছে। যে তরিকাগুলো মুসলিম বিশ্বে বিরাজমান।

আধ্যাত্মিক সিলসিলা তাসাউফের বিস্তৃত রূপের পরিচায়ক। মুকাদ্দামা- এ ইবনে খুলুদুন, আত-তরীফাত, তাফহীমুল ইসলাম, আবজাদুল উলুম, কশফুজ জুনুন, আররিসালাতুল মুছতাতরাফা, ইহয়াউ উলুমিদ দীন, আইয়ুহাল ওয়ালাদ, কাশফুল মাহজুব, নুরুল ইরফান, মিরকাতুল মাফাতীহ, আল হাদিকাতুল নদীয়াহ, ফাতোয়া এ রেজভীয়া, শুয়াবুল ঈমান, মলফুজাতে আ'লা হযরত, আনওয়ারে আউলিয়া ও আদাবে মুর্শিদে কামিল ইত্যাদি গ্রন্থের আলোকে তাসাউফের কর্মপদ্ধতি, পীর-মুরিদী, পীরের মর্যাদা, প্রয়োজনীয়তা, যোগ্যতা, শর্তাবলী, ও মুরিদের করণীয় বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নরূপ।

৩-এর পাতায় দেখুন

বাতেনী জ্ঞান

সাইফুল ইসলাম দীপক

সাধারণত জ্ঞান বলতে বুঝি বইপুস্তকে যা পাওয়া যায় তা-ই। যে যত বইপুস্তক পড়েছেন, ডিগ্রি অর্জন করেছেন আমাদের কাছে মনে হয় তিনিই তত বেশি জ্ঞানী। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি নিয়ে মনে করি অনেক বড় জ্ঞানী হলাম! আপাত দৃষ্টিতে তা মনে হলেও আসল জ্ঞান আরও গভীরে। বইপুস্তকের জ্ঞান এক ধরনের বাহ্যিক বা শরিয়তি জ্ঞান, যে জ্ঞানের মাধ্যমে দুনিয়াতে কোনরকম চলা যায়। কিন্তু আরেক রকম জ্ঞান আছে, যা ধ্যানের মাধ্যমে অর্জন করতে হয়। সে জ্ঞানের কোন সীমা পরিসীমা নেই। যেমন ধরুন, সাগরের মধ্যে একটি

৩-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক : হাজী মোহাম্মদ মহিউদ্দিন, সম্পাদকমণ্ডলী : রানা শফিউল্লাহ, আলহাজ্ব জয়নাল আবেদীন, মোঃ কামরুল ইসলাম, নির্বাহী সম্পাদক : সেহাঙ্গল বিপ্লব
প্রকাশক : মোহাম্মদ ইউনূছ কর্তৃক কুতুববাগ মোজাদ্দেদিয়া প্রিন্টিং প্রেস, ৩৪ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সদর দপ্তর : কুতুববাগ দরবার শরীফ, ৩৪ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা।
ফোন : +৮৮-০২-৮১৫৬৫২৮, মোবাইল : +৮৮-০১৭২৬ ৪৫৯ ০০৪, ০১৭২৩ ৪৮২ ২৯৪, ই-মেইল : masikattaralo@gmail.com, www.kutubbaghdarbar.org.bd.